ভূমিকা

১. পটভূমি

বাংলাদেশ ২০২৪ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের পর্যায়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চলেছে। এই কর্মকৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাস্তুচ্যুতি প্রতিরোধ এবং বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীকে যথাযথভাবে পুনর্বাসন ও তাদের জৈবিক ও আর্থিক নিরাপত্তা বিধান করতঃ দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীকে একীভূত করে ও তাদের জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও বদ্বীপ পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে মর্মে আমরা আশাবাদী।

বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত বন্যা, গ্রীষ্মকালীন ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়ে থাকে। এই সব দুর্যোগ নাজুক ও ঝুঁকিপূর্ণ সামাজিক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানুষের প্রাণহানি, অবকাঠামোর ক্ষতি এবং জীবন ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। অনেক ক্ষেত্রেই পরিবার কিংবা এলাকাবাসী তাদের বসত বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বর্তমানে যে পরিমাণ বাস্তুচ্যুতি ঘটছে, তার মাত্রা ও তীব্রতা আসন্ন বছরগুলোতে আরও অনেক বেশি হবে। এসব কারণে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের একক বৃহত্তম ক্ষতিকর রূপ হতে যাচ্ছে অভিবাসন/বাস্তুচ্যুতি।

সাম্প্রতিক এক খতিয়ানে দেখা গেছে, ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বে প্রতি ৪৫ জনে ১ জন এবং বাংলাদেশে প্রতি ৭ জনে ১ জন জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাস্তুচ্যুত হবে। অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (IDMC)' র হিসাব অনুযায়ী ২০০৮ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশের ৪৭ লক্ষেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। একই সংস্থার ২০১৯ সালের অর্ধবার্ষিকী প্রতিবেদনের হিসাব মতে, বাংলাদেশের ২৩টি জেলা থেকে প্রায় ১৭ লক্ষ মানুষকে স্থানান্তরিত হতে হয়েছে; এর বেশিরভাগই ঘটেছে বিভিন্ন উপকূলীয় জেলাগুলোতে, যেমন ভোলা, খুলনা ও পটুয়াখালী। আদমশুমারির (২০১৩) ভিত্তিতে চালানো রামরু ও এসসিএমআর- এর ২০১৩ সালের যৌথ গবেষণার পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০১১ থেকে ২০৫০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ১৬ থেকে ২৬ মিলিয়নের বেশি মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের কারণে নিজ বসতভিটা ছেড়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত হবে। ব্যাপক এই বাস্তুচ্যুতির ফলশ্রুতিতে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুরাসহ দেশে বিদ্যমান অন্যান্য ধরনের শ্রম অভিবাসীরাও মূলত দেশের ভেতরেই অভিবাসিত হবে।

ডিসপ্লেসমেন্ট সল্যুশানস-এর এক গবেষণা মতে, উপকূলীয় এলাকাগুলোতে বাস্তুচ্যুতির মূল কারণ জোয়ারের পানির উচ্চতাবৃদ্ধি যা উপকূলীয় অঞ্চলে বন্যা ঘটায়। বাস্তুচ্যুতির মাধ্যমিক কারণ হিসেবে গ্রীষ্মকালীন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসকে চিহ্নিত করা হয়েছে। গবেষণাটিতে ধারণা করা হচ্ছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি (SLR) দুর্যোগের এসব প্রক্রিয়ার আরও অবনতি ঘটাতে পারে এবং ২০৮০ সালের মধ্যে তলিয়ে যেতে পারে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ১৩ শতাংশ ভূমি। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাবৃদ্ধির অনুমেয় সবচেয়ে গুরুতর ফল হলো চাষযোগ্য জমি, মাটি এবং পানিতে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং তার পরিণতিতে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রায় বিরূপ প্রভাব। এটি উপকূলীয় অঞ্চলে বাস্তুচ্যুতির অন্যতম বড় কারণ। অন্যদিকে মূল ভূখন্ড এলাকায় বাস্তুচ্যুতি ঘটানোর মূল কারণ নদীভাঙন ও বন্যা। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোয় নিয়মিত খরা হয় এবং এটাও এসব এলাকায় বাস্তুচ্যুতি ঘটিয়ে থাকে। ভূতাত্ত্বিকভাবে কয়েকটি সক্রিয় ভূ-চ্যুতির মধ্যে অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ উচ্চমাত্রায় ভূমিকম্পের ঝুঁকিপ্রবণ দেশ। ভারতীয় টেকটোনিক প্লেটের উত্তরপূর্ব কিনারে

বাংলাদেশের অবস্থান। সক্রিয় সাবডাকশন জোন ও মেগা থ্রাস্ট ফল্টের কারণে এ অঞ্চলের ভূমিকম্পের ঝুঁকি আগের ধারণার চাইতেও বেশি হতে পারে। ভূমিকম্পও শহর ও উপশহরগুলোতে বড় আকারের বাস্তুচ্যুতি ঘটাতে পারে।

দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতির সমস্যা মোকাবিলায় দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো আরও বেশি করে উপলব্ধি করছে। ভানুয়াতু ইতিমধ্যে দুর্যোগ ও জলবায়ুজনিত বাস্তুচ্যুতদের জন্য একটি নীতিমালা তৈরি করেছে। ফিজি জলবায়ু ও দুর্যোগের প্রেক্ষিতে বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসনের জন্য একটি নির্দেশিকা তৈরি করেছে। যেমন কানকুন এডাপটেশন ফ্রেমওয়ার্ক (২০১০), দুর্যোগ-ঝুঁকি প্রশমনে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক (২০১৫-২০৩০) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিল জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতির মতো ভীতিকর চ্যালেঞ্জটিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে মোকাবিলা করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। ক্রমবর্ধমান সচেতনতা এবং দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস (DRR) ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে (CCA) দৃঢ় অঙ্গীকারের আলোকে বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনার জন্য এই কৌশলপত্র প্রণয়ন করছে। প্রণীত এ কৌশলপত্র কেবল দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের বিষয়েই জাতীয় কৌশলপত্র হিসেবে কাজ করবে।

১.১ কৌশলপত্রের যৌক্তিকতা

বাস্তুচ্যুতির শিকার ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠী বাস্তুচ্যুতির কারণে তাদের অধিকার ও দাবি আদায়ে মারাত্মক অসুবিধায় পড়েন। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা বিপর্যয়ের পরে বহু রকমের মানবাধিকার সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। তাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়ে। তাঁরা লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার হন, সাহায্য, সেবা, অপরিহার্য সামগ্রী এবং অনুদান পাওয়ার বেলায় বৈষম্যের কবলে পড়েন। শিশু, এতিম, গর্ভবতী মা, প্রবীণ এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষেরা অবহেলা, নিগ্রহ ও শোষণের শিকার হন; বিশেষ করে শিশু, বৃদ্ধ, শারীরিকভাবে অক্ষম এবং টিকে থাকার জন্য পরিবারের ওপর নির্ভরশীলেরা অনেক সময় পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ব্যক্তিগত দলিলপত্র হারিয়ে যায় বা ধ্বংস হয়; সেগুলি নতুন করে তৈরি করাও কঠিন, কেননা এ ধরনের জনগোষ্ঠীর জন্য জন্মনিবন্ধনের ব্যবস্থা, আইন প্রয়োগের বন্দোবস্ত এবং সুষ্ঠু ও কার্যকর বিচার ব্যবস্থার বিশেষ সুযোগ পাওয়ার উপায় খুবই সীমিত। মতামত প্রদান ও অভিযোগ দায়েরের ব্যবস্থাও অপ্রতুল। কাজ ও জীবিকার সুযোগের অসমতা, জোরপূর্বক স্থানান্তর; দুর্যোগে বাস্তুচ্যুত মানুষদের অনিরাপদ ও অনৈচ্ছিক প্রত্যাবর্তন বা পুনর্বাসন; সম্পত্তি পুনরুদ্ধার ও জমিপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর দুর্ভোগের কিছু উদাহরণ।

বাংলাদেশ সরকার ২১০০ সালের মধ্যে ‘নিরাপদ, জলবায়ু সহিষ্ণু এবং সমৃদ্ধ ব-দ্বীপ’ অর্জনের লক্ষ্যে ‘*বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০*’- প্রণয়ন করেছে। এই পরিকল্পনায় প্রতীয়মান হয় যে, দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিবাসন ও বাস্তুচ্যুতি নগরায়ণের ওপরে চাপ বাড়াচ্ছে। তাই সুশৃঙ্খল অভিবাসন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে নগরগুলো থেকে এই চাপ সুষ্ঠুভাবে কমিয়ে আনার প্রয়োজনীয়তা এখানে গুরুত্ব পেয়েছে। জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনায় (NAPA, 2005) দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের বিষয়ে কোনও অভিযোজন প্রকল্প বা কর্মসূচির নির্দেশনা ছিল না। সরকারের মূল জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলগত কাঠামো, *বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯* এ (BCCSAP, 2009) অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের ওপর কোনও বিশদ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। তাছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনে জরুরি ভিত্তিতে আশ্রয়দান এবং নতুন বসতায়নের প্রেক্ষিতে পুনর্বাসন কিংবা পরিকল্পিত স্থানান্তর বিষয়ক ধারা

সন্নিবেশিত না থাকায় প্রয়োজনীয় বিধিমালা এখনো প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি-২০১৯ এ-জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরের বিভিন্ন বাস্তবায়নকারীদের বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে। তবে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলিতে মূলত জরুরি পরিস্থিতিতে আশ্রয় প্রদানের পর্যায়ের ওপর বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে । 'বাস্তুচ্যুতি কমানো' এবং 'দীর্ঘমেয়াদি টেকসই সমাধানের' মতো গুরুত্বপূর্ণ দুটি পর্যায়কে এখানে অন্তর্ভূকরণ সম্ভব হয়নি। তাই বাংলাদেশ সরকার ব্যাপক কৌশলগত নীতি কাঠামো, নির্দিষ্ট আইনি আদেশ এবং বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বাস্তুচ্যুতির বিষয়টি মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বাস্তুচ্যুতির বিষয়ে নতুন পন্থার মধ্যে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে (DRR/CCA) সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্কসহ (২০১৫-২০৩০) নানসেন ইনিশিয়েটিভ্স প্রটেকশন এজেন্ডা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দুর্যোগ বাস্তুচ্যুতি বিষয়ক প্লাটফরম (PDD) বর্তমানে তা বাস্তবায়ন করছে। এই কৌশলপত্র এসব আন্তর্জাতিক কাঠামোর প্রক্রিয়ার প্রতি বাংলাদেশের দায়িত্ববোধেরই অংশ।

২০১৫ সালে ১০৯টি দেশ যে সুরক্ষা এজেন্ডা (PA) তে স্বাক্ষর করেছে, তাতে দুর্যোগ ঝুঁকি কমানো এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় যথার্থ অভিযোজন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত বাস্তুচ্যুতি কমিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে । যেখানে বাস্তুচ্যুতি ঠেকানো সম্ভব নয় সেখানে স্থায়ী সমাধান যথা স্ব-ভূমিতে প্রত্যাবর্তন, স্থানীয়ভাবে একত্রীকরণ এবং পরিকল্পিত পুনর্বাসন না-হওয়া পর্যন্ত স্থানান্তর ও বাস্তুচ্যুতির পুরো পর্যায়ে ভুক্তভোগী জনগণের সুরক্ষায় অধিকারভিত্তিক ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত *গ্লোবাল প্ল্যাটফরম অন ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (GPDRR)-এর* সহ-সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপে এই বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে। দুর্যোগ আঘাত হানার আগেই দুর্যোগজনিত বাস্তুচ্যুতি কমাতে সরকার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আরও বেশি কাজ করতে হবে । দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সংক্রান্ত কৌশল ও নীতিমালাগুলোকে দুর্যোগজনিত বাস্তুচ্যুতির কারণ ও পরিণতিগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে পরিত্রাণে স্থায়ী সমাধানে অবদান রাখতে হবে। জলবায়ু ও দুর্যোগ ঝুঁকিকে অবশ্যই অভিবাসনের উপাদান হিসেবেও ধরতে হবে। ২০১৮ সালের অভিবাসন বিষয়ক '*গ্লোবাল কমপ্যাক্ট অন সেইফ, অর্ডারলি এন্ড রেগুলার মাইগ্রেশন* শীর্ষক সম্মেলনেও উঠে এসেছে।

এই কৌশলপত্রে তাই বাস্তুচ্যুতিকে দুর্যোগ ঝঁকিহ্রাস (DRR) ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের অংশ হিসেবে দেখার আন্তর্জাতিক মতৈক্যেরই প্রতিফলন ঘটেছে। সুতরাং এই কৌশলপত্র সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্কের সিদ্ধান্ত এবং প্ল্যাটফরম অন ডিজাস্টার ডিসপ্লেসমেন্টের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বাংলাদেশে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপগুলির অংশ। এই কৌশলপত্র বিশেষ করে দুর্যোগজনিত বাস্তুচ্যুতি এবং মানব চলাচলের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার জন্য স্থানীয়, জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে গৃহীত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস (DRR)-এর পদক্ষেপগুলোর সঙ্গে আঞ্চলিক জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা পদক্ষেপগুলিকে সংযুক্ত করে কর্মসূচি প্রণয়নে সহায়তা করবে এবং প্ল্যাটফরম অন ডিজাস্টার ডিসপ্লেসমেন্ট (PDD)- এর পরামর্শ অনুযায়ী দুর্যোগজনিত বাস্তুচ্যুতি বিষয়ে পদ্ধতিগতভাবে ডেটাবেজ তৈরির উদ্যোগ নেবে। বাস্তুচ্যুতির প্রতি এই নতুন সামগ্রিক পদক্ষেপ টেকসই ফলাফল নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। এই কৌশলপত্রটি সরকারের সামাজিক উন্নয়ন কাঠামো (SDF) এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন বিষয়ক অন্যান্য নীতিকাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বাংলাদেশ সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই কর্মকৌশল দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি বিষয়ক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অন্যতম এক পদক্ষেপ।

১.২ কৌশলপত্রের রূপকল্প, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

কৌশলপত্রটির দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প হলো দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের নাজুক অবস্থায় থাকা জনগোষ্ঠীকে পরিবর্তনশীল জলবায়ু ও দুর্যোগের প্রতি সহিষ্ণু বা অভিঘাত-সক্ষম করে তোলা। কৌশলপত্রটির লক্ষ্য হলো স্থায়ী সমাধান খোঁজার সময়ে এমন সামগ্রিক অধিকারভিত্তিক বাস্তবায়নযোগ্য টেকসই কাঠামো গড়ে তোলা যা বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্যোগ ও জলবায়ুজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির (DCIIDPs) শিকার মানুষদের শ্রদ্ধা করবে, সুরক্ষা দেবে এবং তাদের অধিকার নিশ্চিত করবে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে কৌশলপত্রটির উদ্দেশ্য হলো:

ক. জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নীতি নির্দেশনা ও কর্মপরিকল্পনার জন্য সাধারণ ও সুসংহত ভিত্তি তৈরি করা;

খ. প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির হার কমাতে প্রতিরোধমূলক ও অভিযোজনমূলক উভয় ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

গ. নিরাপদে, স্বেচ্ছায় এবং মর্যাদার সঙ্গে আগের আবাসস্থলে প্রত্যাবর্তন/স্থানীয়ভাবে একীভূতকরণ অথবা স্থানান্তর/পুনর্বাসনের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে খাতভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা;

ঘ. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতিকে কার্যকর ও দক্ষভাবে ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তুচ্যুতদের অধিকারপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা; এবং

ঙ. সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাস্তুচ্যুতদের জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি ও তাদের সার্বিক মানবিক উন্নয়ন ঘটানো।

১.৩ কৌশলপত্রের আওতা

কৌশলপত্রটি শুধু জলবায়ু ও দুর্যোগজনিত কারণে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি বিষয়ে প্রযোজ্য হবে, আন্তঃসীমান্ত বাস্তুচ্যুতি সমস্যা বিষয়ে নয়। এই কৌশলপত্রটির উদ্দেশ্য বাস্তুচ্যুতির তিনটি পর্যায়কে সামগ্রিক কৌশলের আওতাভুক্ত করা; যথা-

(অ) প্রাক-বাস্তুচ্যুতি

(আ) বাস্তুচ্যুতিকালীন অবস্থায় এবং

(ই) বাস্তুচ্যুতি-পরবর্তী সময়ে (স্থায়ী সমাধান)।

কৌশলপত্রের বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো, এটি সকল মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান কার্যক্রমগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের অন্তর্ভুক্ত করার দিকনির্দেশনা দেয়।

দুর্যোগ ও জলবায়ুজনিত বাস্তুচ্যুতির ওপর বিভিন্ন গবেষণালব্ধ ফলাফল পর্যালোচনা করে এবং জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে এই কৌশলপত্রটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাস্তুচ্যুতির জন্য নিম্নে বর্ণিত জলবায়ু/আবহাওয়া-সম্পর্কিত দুর্যোগগুলিকে চিহ্নিত করেছে: বন্যা, উপকূলীয় ও নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, খরা, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, পাহাড়ি এলাকার ভূমিধস ও ভূমিকম্প।

১.৪ দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের (DCIIDPs) সংজ্ঞা

পেনিনসুলা নীতিমালার সাথে এবং এই কৌশলপত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত মানুষের সংজ্ঞা নিম্নরুপ:

"আকস্মিক ও ধীর গতিসম্পন্ন জলবায়ুজনিত দুর্যোগ বা প্রক্রিয়ার কারণে ব্যক্তি, পরিবার অথবা পুরো একটি জনগোষ্ঠী যখন অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হন, অথবা তাদের বাড়িঘর বা চিরাচরিত আবাসস্থল থেকে তাদের সরিয়ে নেওয়া হয় কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রাষ্ট্রীয় সীমানা অতিক্রম করেননি, তারাই অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু''।

জলবায়ুজনিত আকস্মিক বাস্তুচ্যুতি মোকাবিলা জোর দেয় পুনরুদ্ধার কৌশলের ওপর। অন্যদিকে ধীরে ঘটে চলা দুর্যোগে প্রস্তুতি ও অভিযোজন কৌশলের ওপর জোর দেওয়ার দরকার হয়।

এই কৌশলপত্রে গৃহীত সংজ্ঞার একটি অন্যতম দিক হলো এটি অভিবাসনের বেলায় অস্থায়ী ও স্থায়ী সব ধরনের বাস্তুচ্যুতিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। অস্থায়ী ও স্থায়ী বাস্তুচ্যুতির সুরক্ষা কৌশলে অনেক ব্যবহারিক পার্থক্যও রয়েছে। অস্থায়ী অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতিকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যে, এটা হচ্ছে যাদের পূনরায় স্ব-এলাকায় ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে তেমন স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে জলবায়ুজনিত দুর্যোগের কারণে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্থানান্তর। অন্যদিকে স্থায়ী বাস্তুচ্যুতি তাকেই বলা হয়, যেখানে দীর্ঘ এবং অতি দীর্ঘ মেয়াদেও আপন এলাকায় প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

সংজ্ঞায়নের এই জটিলতা কাটিয়ে উঠতে এই কৌশলপত্রটি CDMP II- এ বাস্তুচ্যুত মানুষের যে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে তা অনুসরণ করে। CDMP II অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুতদের তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে। এগুলো হলো:

অ) অস্থায়ীভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি/গোষ্ঠী;

আ) অস্থায়ী ও স্থায়ী এ-দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকা বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি/গোষ্ঠী এবং

ই) স্থায়ীভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি/গোষ্ঠী।

১.৫ দুর্যোগ ও জলবায়ুজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি (DCIID) ব্যবস্থাপনার সমন্বিত পদ্ধতি প্রণয়ন

বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প হচ্ছে, মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করে ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলা। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সরকারের এই কৌশলগত রূপকল্পের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ সরকার তার বৃহত্তর সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর (SDF) মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নীতিমালা, কর্মপরিকল্পনা এবং কৌশল ঢেলে সাজাচ্ছে এবং নতুন করে প্রণয়ন করছে।

এই কৌশলপত্রটিকে অবশ্যই সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে, যা কিনা সরকারের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশল এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ, অর্থনৈতিক অর্ন্তভূক্তিকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, অক্ষম ব্যক্তি, অতি দরিদ্র ও ভাসমান জনসাধারণের সামাজিক অর্ন্তভূক্তিকরণের কৌশলসমূহের পাশাপাশি পরিবেশগত নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং

সর্বোপরি টেকসই উন্নয়ন কৌশলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। উন্নয়ন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সমতা ও সামাজিক ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশকে সহায়তা করার মতো একটি সামগ্রিক এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতিমালা তৈরি করা এই কর্মকাঠামোর লক্ষ্য।

বাংলাদেশের অভিঘাত-সহিষ্ণু সমাজ, জলবায়ু কার্যক্রম এবং দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমের যে সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, কৌশলপত্রটি তার ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সরকার তার মানবিক সহায়তামূলক কর্মসূচি ও উন্নয়নমুখী কার্যক্রমগুলোকে ঢেলে সাজানোর মাধ্যমে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অভিঘাত-সহিষ্ণু সমাজ গড়ার লক্ষ্যে প্রথাগত ত্রাণভিত্তিক কার্যক্রম থেকে সরে এসে সামগ্রিক দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাসকরণ পদ্ধতি বিকশিত করার দিকে মনোনিবেশ করছে। দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাসকরণের জন্য তৈরি সেন্দাই কর্মকাঠামোতেও এ ধরনের পরিবর্তন লক্ষণীয়, যেখানে দুর্যোগ হ্রাস করার বেলায় দুর্যোগ প্রতিরোধ থেকে শুরু করে দুর্যোগে সাড়াদান এবং পুনর্গঠনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সামগ্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। কৌশলগত সাড়াদান প্রক্রিয়াকে আরও বেশি সামগ্রিক ও কার্যকর করার জন্য এই কর্মকৌশলটিতে দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনার নতুন পদ্ধতি বিবেচনায় আনা হয়েছে। যেহেতু কৌশলগত সাড়াগুলো নিজ থেকেই সমভাবে সবার জন্য উপকার বয়ে আনতে পারে না, তাই বাস্তুচ্যুতি মোকাবিলার ক্ষেত্রে যে কোনও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি প্রণয়নের প্রশ্নে মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক দলিলাদিতে ঘোষিত মূলনীতিগুলোকে প্রাধান্য দেয়া হবে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক মানবাধিকার বিষয়ক মূলনীতিতে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তার আইনি এখতিয়ারভুক্ত সকল নাগরিকের মানবাধিকারের প্রতি দায়বদ্ধ। ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, অক্ষম ব্যক্তি, বয়স, লিঙ্গ, জাতীয়তা, ধর্মীয় বিশ্বাস নিরপেক্ষভাবে সকলের জন্য সমতা ও বৈষম্যহীনতা এবং শ্রদ্ধা, সুরক্ষার নিশ্চয়তা সৃষ্টির দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের।

এভাবে 'অধিকারভিত্তিক পদ্ধতি' (RBA) ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম, মানবিক সহায়তা ও বাস্তুচ্যুতি সমস্যার টেকসই সমাধানে প্রয়োজনীয় আদর্শ মানদন্ড সরবরাহ করে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির ক্ষেত্রে অধিকারভিত্তিক পদ্ধতি মূলত বাস্তুচ্যুত মানুষের অধিকারের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত; যে অধিকারের কথা বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের পাশাপাশি তথ্য প্রাপ্তির ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারের কথা। আবার যেহেতু দরিদ্র জনগোষ্ঠী, ভাসমান মানুষ, শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি[1], ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সাধারণত যে কোনও অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির বেলায় অসম মাত্রায় ঝুঁকির মুখোমুখি হয়, সেহেতু অধিকারভিত্তিক এই পদ্ধতি এ সকল মানুষের প্রয়োজনীয়তা ও নিরাপত্তাকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করে। এই পদ্ধতি সমতা ও বৈষম্য দূরীকরণের নীতিগুলোকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে।

সমন্বিত পদ্ধতি পরিচালনার মাধ্যমে কৌশলপত্রটি আইওএম (IOM) -এর অভিবাসন ব্যবস্থাপনা চক্রের (MMC) সঙ্গে সমন্বয় করে একটি বাস্তুচ্যুত ব্যবস্থাপনা কাঠামো (DMF) তৈরি করেছে। এর উদ্দেশ্য হলো বাস্তুচ্যুতির সময় বিভিন্ন ধাপে যথাযথ সাড়াদান কার্যক্রমগুলো চিহ্নিত করা।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো (DMF) এই অর্থে সামগ্রিক ও বাস্তবধর্মী যে, এটি বাস্তুচ্যুতির বিভিন্ন ধাপকে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করে এবং বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন কৌশলগত তৎপরতা কী হবে তা নির্ধারণ করে। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয় হলো, এই কাঠামোতে বাস্তুচ্যুতির বিভিন্ন ধাপে কৌশলগত সাড়াগুলো নির্দিষ্ট করা। এর লক্ষ্য হলো বাস্তুচ্যুতির বিভিন্ন ধাপে বিশেষ করে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গৃহীত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সহায়ক নীতিমালা (GPID) তিনটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা তুলে ধরে:

অ) বাস্তুচ্যুতি রোধ

আ) বাস্তুচ্যুতির সময় মানুষকে রক্ষা করা

ই) বাস্তুচ্যুতি পরবর্তীতে টেকসই সমাধান করা।

এটিই হলো বাস্তুচ্যুতি মোকাবিলায় মানবাধিকার-ভিত্তিক পদ্ধতির মূল ভিত্তি। এর মাধ্যমে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি বাস্তুচ্যুতির বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা নেওয়ার কথা বলা হয়। এ ছাড়া বাস্তুচ্যুতির মোকাবিলায় রাষ্ট্রের যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং তা কোনও দুর্যোগ ঘটার আগে থেকেই যে পালন করতে হয়; এর মাধ্যমে সে বিষয়টিও সামনে চলে আসে।

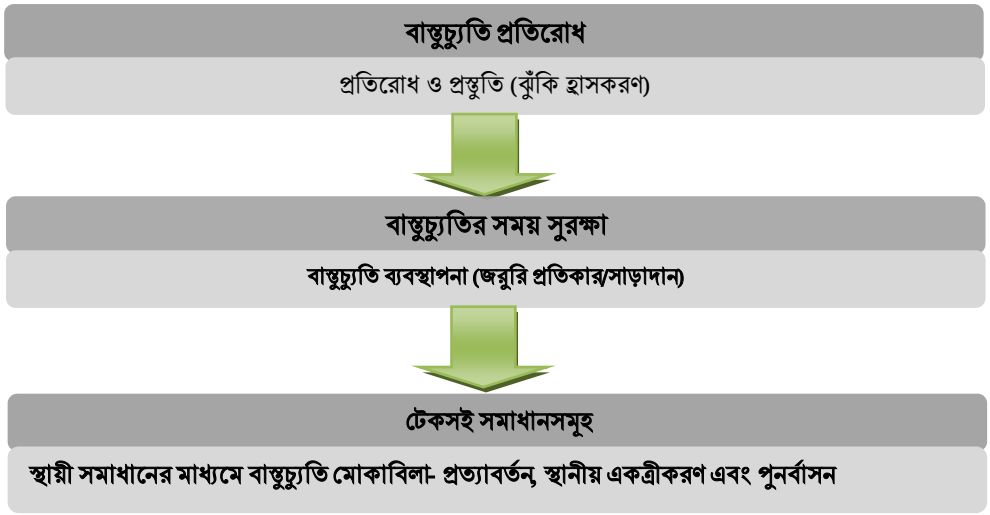

রেখাচিত্র ১: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো

রেখাচিত্র ১ দেখায় প্রাক-বাস্তুচ্যুতির ধাপে সাধারণত কৌশলগত সাড়াদান/পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তুচ্যুতির ঝুঁকি হ্রাস করা, কিন্তু বাস্তুচ্যুতির সময় কৌশলগত সাড়াদান/পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো অস্থায়ী বাস্তুচ্যুতি কমানো। পক্ষান্তরে বাস্তুচ্যুতি-পরবর্তী ধাপে দীর্ঘস্থায়ী বাস্তুচ্যুতির টেকসই সমাধান এই কৌশলগত সাড়াদানের লক্ষ্য। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো ব্যবহার করে কৌশলপত্রটি চারটি কৌশলগত সাড়াদান/কার্যক্রম চিহ্নিত করে যথা: প্রতিরোধ, প্রস্তুতি, ব্যবস্থাপনা ও মোকাবিলা।

কৌশলগত সাড়াদান প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে, **প্রতিরোধের** লক্ষ্য হলো, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অভিযোজনের মাধ্যমে ঝুঁকি বা নাজুকতা কমিয়ে আনা এবং সমাজের অভিঘাত-সক্ষমতা বা সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে বাস্তুচ্যুতি রোধ করা। যখন স্থানীয় অভিযোজন কিংবা দুর্যোগ প্রতিরোধ সম্ভব নয় যেমন: সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে অভিবাসন/স্থানান্তর/পুনর্বাসনের জন্য **প্রস্তুত** করাই হলো দ্বিতীয় কৌশলগত সাড়াদানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রস্তুতকরণের এই ধাপে আরও যে সমস্ত বিষয় সামনে চলে আসে তা হলো: ক্ষতিগস্ত মানুষের অধিকার কার্যকরভাবে সমুন্নত রেখে তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া। মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ, আগে থেকেই স্থায়ী ও অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র শনাক্তকরণ, মূল সেবা প্রদানকারী সংস্থা যেমন: স্বাস্থ্যবিভাগ, পুলিশ, পরিবহন ইত্যাদি কীভাবে দুর্যোগের

সময় কাজ করবে তার নিয়মকানুন ঠিক করা। তৃতীয় কৌশলগত সাড়াদান কার্যক্রম হলো বাস্তুচ্যুতির **ব্যবস্থাপনা।** এই ধাপে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত তা হলো জরুরি মানবিক সহায়তা, কার্যকর এবং অধিকারভিত্তিক স্থায়ী ও অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, খাদ্য, আশ্রয়, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, নিরাপত্তা এবং যারা আশ্রয়কেন্দ্রে আসতে পারেনি তাদের সেবা প্রদান। আর চতুর্থ কৌশলগত সাড়াদান কার্যক্রম হলো টেকসই সমাধানের মাধ্যমে বাস্তুচ্যুতি **মোকাবিলা** করা।

এটি মূলত করা হবে তিনটি ধাপে:

১) প্রত্যাবর্তন

২) স্থানীয়ভাবে একীভূতকরণ এবং

৩) পুনর্বাসন।

যেহেতু অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি একটি জটিল বিষয়, তাই বাস্তুচ্যুত মানুষের বিভিন্ন ধরন নির্দিষ্ট করে প্রেক্ষিতনির্ভর প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। সাধারণভাবে কৌশলগত সাড়াদান কার্যক্রমগুলো প্রতিরোধ, প্রস্তুতি এবং ব্যবস্থাপনার দিক থেকে বিপদাপন্ন জনগণকে লক্ষ্য করে প্রণীত হয়েছে। অন্যদিকে তিন ভিন্ন ধরনের বাস্তুচ্যুত মানুষের দীর্ঘমেয়াদী সমাধান নিশ্চিত করাই হচ্ছে উপরে বর্ণিত তিনটি স্থায়ী সমাধানের লক্ষ। প্রত্যাবর্তন অস্থায়ীভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষদের সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা। অন্যদিকে যারা স্থায়ীভাবে বাস্তুচ্যুত, তাদের জন্য স্থায়ী সমাধান হিসেবে স্থানীয়ভাবে একীভূতকরণের কথা বিবেচনা করা হয়। যারা অস্থায়ী ও স্থায়ী ক্যাটাগরির মাঝামাঝি বাস্তুচ্যুত; তাদের জন্য পরিকল্পিত পুনর্বাসনের (resettlement) ব্যবস্থা নেয়া হয়। এই শ্রেণির মানুষ সবচেয়ে বেশি বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত হয়। তারা না পারে তাদের নিজ বসত ভিটায় ফিরে যেতে না পারে অন্য কোনও নিরাপদ জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে। প্রায়শই তারা পুনর্বার বাস্তুচ্যুতির ঝুঁকির মুখে থাকে। প্রতিটি বাস্তুচ্যুতির ঘটনা স্বতন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করে স্থানীয়ভাবে প্রেক্ষিতনির্ভর যথাযথ সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। স্থায়ী সমাধানের ক্ষেত্রে অধিকারভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগের বেলায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই মূল কথা। এ ধরনের জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে বৈচিত্র্য এবং ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা রয়েছে তা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। স্থায়ী প্রত্যাবর্তন কারও কারও জন্য কাঙ্খিত ও সম্ভাব্য সমাধান হতে পারে, অন্যান্যদের ক্ষেত্রে স্থানীয় একীভূতকরণ অনেক বেশি মানানসই। যে কোনও সমাধানের ব্যবস্থায় অবশ্যই ক্ষতিগস্ত ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর ইচ্ছার প্রতিফলন থাকতে হবে এবং তাদের পরিপূর্ণভাবে অবহিত করার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

যেহেতু দুর্যোগের মাত্রা ও তীব্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে, সেহেতু সমন্বিত সমাধানের ব্যবস্থা প্রয়োজন হতে পারে। এ ধরনের সমাধানে ঋতুভিত্তিক ও অস্থায়ী অভিবাসনের সুযোগ থাকতে হবে। একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সদস্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অভিবাসনকে সমাধান হিসেবে বিবেচনা করতে পারে। পরিবারের কোনও সদস্য তাদের মূল বাসস্থানে স্থায়ীভাবে কিংবা ঋতুভিত্তিকভাবে প্রত্যাবর্তন করতে পারে, পক্ষান্তরে অন্য সদস্যরা অন্য জায়গায় গিয়ে কাজ করতে পারে। তাই সমাধানগুলো হবে খুবই নমনীয়, যাতে করে সকলেই যার যার সমাধান স্বেচ্ছায় ও অবহিত হওয়ার মাধ্যমে বেছে নিতে পারে। বাস্তুচ্যুতির পরবর্তী পর্যায়ে সহায়তা ও সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণার্থে নীতিমালা অনুসরণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন: নারীপ্রধান পরিবার, শিশু, অক্ষম ব্যক্তি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের বিশেষ চাহিদার কথা বিবেচনায় নিয়ে কর্তৃপক্ষকে তাদের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে।

২. বাস্তুচ্যুতি প্রতিরোধ (PREVENTION OF DISPLACEMENT)

বাস্তুচ্যুতি প্রতিরোধ সম্পর্কিত অধিকারগুলোর উদাহরণ: বৈষম্যহীনতা ও সমতার অধিকার, নিরাপত্তার অধিকার, জীবনের অধিকার, উন্নয়নের অধিকার, বাসস্থানের অধিকার, কাজ পাওয়ার অধিকার, অংশগ্রহণের অধিকার, তথ্য পাওয়ার অধিকার।

উদ্দেশ্য: এই অধিকারগুলোর স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন এবং দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস/ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিপদাপন্ন মানুষদের সুরক্ষা দেওয়া।

কৌশলগত সাড়া প্রদান : বাস্তুচ্যুতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা হলো, স্থানান্তর ও বাস্তুচ্যুতি ঘটার আগেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। বাস্তুচ্যুতির প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিনিয়োগ/অর্থায়ন সত্বেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাস্তুচ্যুতি ঘটে। এর ফলে জনগণ আরও বেশি ঝুঁকি বা সংকটের মুখে পড়ে। বাস্তুচ্যুতির ক্ষেত্রে স্থানান্তরকে প্রায়ই টিকে থাকার কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ঠিকমতো বাস্তবায়ন করা না গেলে স্থানান্তর বড় ধরনের মানবিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এসব ক্ষেত্রে সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলায় দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের দুর্ভোগ ও জীবিকার ক্ষতি লাঘব করতে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে প্রস্তুত করা। যেমন সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাবৃদ্ধি ও মরুকরণের পরিস্থিতি কিছু এলাকাকে অনাবাসযোগ্য করে ফেলতে পারে বিধায় অন্যত্র পুনর্বাসন/স্থানান্তরের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখা।

প্রধান নীতি-ক্ষেত্রসমূহ: দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অভিযোজন।

প্রধান কার্যক্রমসমূহ (প্রতিরোধ এবং প্রস্তুতিমূলক)

প্রতিরোধ এবং প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলো হলো:

(অ) ঝুঁকির মাত্রা নিরূপণ কার্যক্রম;

(আ) দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসকরণ (DRR) এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে (CCA) পর্যাপ্ত বিনিয়োগ বা অর্থ বরাদ্দ করা;

(ই) জলবায়ু ঝুঁকিহ্রাস সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শক্তিশালী করা;

(ঈ) নগরের অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্রগুলোর কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণে উৎসাহিত করে কর্মসংস্থান/বিকল্প ও শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;

(উ) জলবায়ু-দুর্যোগ ঝুঁকিসহ জমি ব্যবহারের পরিকল্পনা করার সঙ্গে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিরাপদ এলাকা চিহ্নিত করা এবং ওই এলাকাগুলোতে বসবাসরত জনসাধারণের অধিকার রক্ষার স্বার্থে সেসব এলাকায় মানব বসতি নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা করা।

২.১ দুর্যোগ-ঝুঁকি নিরূপণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা (Understanding the Risk and Decision Making Support)

২.১.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় পর্যায়ের কমিটি/প্রতিষ্ঠান যেমন: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির (DMCs) সকল পর্যায় বিশেষ করে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থা কমিটি (UDMC) ও ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (WDMC) এর মাধ্যমে বাস্তুচ্যুতির ওপরে মাঠ পর্যায়ের উপাত্ত সংগ্রহ ও মেলানো এবং হালনাগাদ করা। উপাত্ত ব্যবস্থাপনার জন্য স্মার্ট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অংশ হিসেবে জিআইএস/রিমোট সেন্সিং সিস্টেম (GIS/RMS) প্রতিষ্ঠা করা। সাড়াদান পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সাড়াদান কার্যক্রমের সার্বিক তদারকির দায়িত্ব যৌথভাবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক পালন করা;

২.১.২ লিঙ্গ, বয়স, অক্ষমতা এবং অন্যান্য সূচক দ্বারা সংগহীত উপাত্ত (SADD) আলাদা করা যাতে বাস্তুচ্যুত জনগণ যেমন: নারীপ্রধান পরিবার, পরিবারহীন শিশু, সংখ্যালঘু, বয়স্ক, শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট প্রয়োজনগুলো ঠিকভাবে নিরূপণ করা এবং তাদের অধিকারগুলো রক্ষা করা যায়।

২.১.৩ বাস্তুচ্যুতি বিষয়ে উপাত্ত সংগ্রহের খরচ কমানোর জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্থায়ী আদেশাবলির অধীনে ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতার ধরন (কাঠামোগত এবং অ-কাঠামোগত) নির্ণয় এবং সংকটাপন্ন অবস্থার মূল্যায়ন/পর্যবেক্ষণ করা। জাতীয় আদমশুমারি, খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, জলবায়ু পরিবেশ সংক্ষিপ্তসার, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা জরিপ-এই ধরনের সকল জরিপে বাস্তুচ্যুতি/অভিবাসনের বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা।

২.১.৪ 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' এ উল্লেখ করা ৬টি হটস্পটের (পানি ও জলবায়ুজনিত প্রায় অভিন্ন সমস্যাবহুল অঞ্চল) উপর ভিত্তি করে ঝুঁকি পূর্বাভাস পদ্ধতি ও বাস্তুচ্যুতির বিপদাপন্নতা চিহ্নিতকরণ (ম্যাপিং) ব্যবস্থাকে উন্নত করা। আর্থ-সামাজিক এবং হাইড্রো-মেটেরোলজিক্যাল প্রবণতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাস্তুচ্যুতির নির্ভরযোগ্য পূর্বাভাস তৈরি করা। এই পদ্ধতি শুধুমাত্র জলবায়ুজনিত ঝুঁকি যেমন: বন্যা, খরা, জলোচ্ছাস, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাবৃদ্ধির ফলে বাস্তুচ্যুতির প্রভাব মূল্যায়ন করবে না; এটি বাস্তুচ্যুতি রোধ, প্রশমন কিংবা দুর্যোগের প্রতিক্রিয়াগুলোর ওপরও আলোকপাত করবে। এজেন্ট বেইজড মডেল (ABM) অনুসরণ করে জলবায়ু ও দুর্যোগজনিত কারণে অভিবাসিত এবং বাস্তুচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা আগে থেকেই অনুমান করা যাবে এবং জলবায়ুর অবস্থা কোন সীমায় পৌঁছালে বাস্তুচ্যুতি ঘটবে তা আগেভাগেই নিরূপণ করা যাবে। বাস্তুচ্যুতির হটস্পটগুলোর ম্যাপ করা।

২.১.৫ সিডিএমপি-২ এর নির্দেশনা অনুসরণ করে বাস্তুচ্যুতি ঘটে এমন জায়গাগুলোতে ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা তৈরি করার জন্য সম্প্রদায়ভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ (CRA) কার্যক্রম পরিচালনা করা। ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা এবং সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী বিশেষ করে শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করার জন্য ঝুঁকি নিরুপন কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে পরিচালনা করা। ঝুঁকি হ্রাসের পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে এলাকার জনগোষ্ঠীর লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সুসংবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করা।

২.১.৬ দুর্যোগ মোকাবিলার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে দুর্যোগ প্রতিরোধের বিভিন্ন উপায়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা। পাড়া-মহল্লা পর্যায়ে উঠান বৈঠক, স্থানীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রেডিও, টেলিভিশন, মাইকিং, অনলাইনে এবং ধর্মীয় উপাসনালয়ের মাধ্যমে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগণকে দুর্যোগ সম্পর্কে প্রতিনিয়ত অবহিত করা।

২.১.৭ যদি কোনও কারণে অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর সম্ভব না হয় তবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সাহায্য অনুসন্ধান করা। এর জন্য প্রয়োজন আন্তর্জাতিক ফোরামে দর-কষাকষি এবং কাঠামোগত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা; যাতে করে ওই ধরনের পরিস্থিতি পরিচালনা করা যায়। কৌশলগত সিদ্ধান্ত, সংলাপ, আলোচনা, সুরক্ষা এজেন্ডাভুক্ত শোভন চর্চাগুলোকে চিহ্নিত করে বিশেষ পরিস্থিতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে কাজে লাগানো।

২.২. জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাস সংক্রান্ত সুশাসন প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ (Strengthening climate/disaster risk governance)

২.২.১ এসডিজি ও সেন্দাই কর্মকাঠামোর সঙ্গে সমন্বয় করে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির জন্য একটি সর্বাত্মক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করা যেমন: বিশেষ আইন, নিয়মাবলি, নীতিমালা, প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং একই সঙ্গে বিদ্যমান নীতি কাঠামোর সম্পৃক্তকরণ যাতে করে বাস্তুচ্যুতি ঘটার সময় কার্যকরভাবে সাড়াদান করা যায়।

২.২.২ বাস্তুচ্যুত মানুষের অধিকারের স্বীকৃতি এবং বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনায় সরকারের দায়িত্ব নিশ্চিত করতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২-এ প্রয়োজনীয় সংশোধন করা। জাতীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সমূহের সাথে ধারা ১৭-এ বর্ণিত বাস্তুচ্যুতির ওপর কমিটি গঠনের জন্য আইনগত ভিত্তি প্রয়োজন। একই ভাবে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন আইন ২০১৩ সংশোধনের মাধ্যমে জলবায়ু সংকটাপন্ন এলাকাগুলো থেকে মানুষদের বিদেশে কাজের সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া।

২.২.৩ সরকারের বিদ্যমান নীতিমালা/পরিকল্পনাগুলো যেমন: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জাতীয় পরিকল্পনা ২০২১-২৫ এবং ভবিষ্যতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাস্তুচ্যুতি বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা কিংবা বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা। একইভাবে, স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা যেমন: জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, পৌরসভা/সিটি করপোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং স্থানীয় অভিযোজন পরিকল্পনাগুলোয় বাস্তুচ্যুতির বিষয়টিকে নির্দিষ্ট কোনও ধারায় যোগ করা।

২.২.৪ জাতীয় এবং স্থানীয় উভয় পর্যায়ে দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক আইন এবং পরিকল্পনাগুলোয় জেন্ডার ও অক্ষমতা ইস্যু এবং সংকটাপন্ন শ্রেণির চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করা।

২.২.৫ সরকারি এবং বেসরকারি খাতের পরিকল্পনার মূলধারায় এবং বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জলবায়ু দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাস ও ভূমিকম্পের ঝুঁকি হ্রাসের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিকেন্দ্রীকৃত সম্ভাব্য উন্নয়ন এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদান করা। দীর্ঘ মেয়াদে এই কার্যক্রম বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের নতুন/বিকল্প জীবিকা খুঁজতে সহায়তা করবে।

২.২.৬ আন্তর্জাতিক নির্দেশিকা যেমন দুর্যোগ ও পরিবেশের পরিবর্তন থেকে পরিকল্পিত স্থানান্তরের মাধ্যমে জনগণকে সুরক্ষার নির্দেশিকার (GPPDEC) সঙ্গে সংগতি রেখে অস্থায়ী বাস্তুচ্যুতি পরিহারের শেষ অবলম্বন হিসেবে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পিত স্থানান্তর প্রক্রিয়াকে কৌশল হিসেবে গ্রহণ করার জন্য জাতীয় ও আঞ্চলিক কাঠামোগুলোতে যথাযথ ব্যবস্থা সন্নিবেশ করা।

২.৩ দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ বা অর্থ বরাদ্দ করা (Investing in DRR and CCA)

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ জলবায়ু বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীলতা অর্জনের জন্য গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতি হ্রাসে RR ও CCA- এর অধীনে যে কাজগুলো করতে হবে-

২.৩.১ দ্রুতগতি সম্পন্ন দুর্যোগ যেমন: বন্যা, নদীভাঙন, ভূমিকম্প ও সাইক্লোন এবং ধীর গতি সম্পন্ন জলবায়ুজনিত দুর্যোগ যেমন: খরা মোকাবিলায় পূর্বাভাস পদ্ধতিগুলো শক্তিশালী করা। এসব পদ্ধতি কার্যকর করতে প্রয়োজন দৃঢ় অঙ্গীকার, রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং কার্যকর সাড়াদান কার্যক্রম।

২.৩.২ পূর্বাভাস প্রচার এবং এ ব্যাপারে জনসাধারণের সচেতনতা বাড়াতে কার্যকরী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো নির্দিষ্ট করা। এটি ঝুঁকিতে থাকা সমাজকে আগে থেকে প্রস্তুত করা এবং সরকারি কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে কাজ করতে সহজ করে দেয়। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল (BCCTF) পরিচালিত সরকারি কার্যক্রমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। বাস্তুচ্যুতি বিষয়ে জনসাধারণকে আরও বেশি করে প্রস্তুত করতে এ খাতে অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

২.৩.৩ ঝুঁকিতে থাকা বিভিন্ন বহুমুখী জীবিকা, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর অভিঘাত-সক্ষমতা বা সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করা। সরকারের বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা নীতিমালায় বাস্তুচ্যুত মানুষের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিশেষ ধারা যোগ করা, যাতে তারা বাস্তুচ্যুতির পরেও তাদের প্রাপ্য সামাজিক সুরক্ষার উপাদানগুলো উপভোগ করতে পারে।

২.৩.৪ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষি অভিযোজন চর্চা গ্রহণ করার মাধ্যমে দুর্যোগসহিষ্ণু কৃষি ব্যবস্থার পরিধি বাড়ানো, যেমন: বন্যা, খরা ও লবণসহিষ্ণু শস্যের প্রচলন, ভূমি ও পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং বৃষ্টির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ শস্য রোপণ পদ্ধতির প্রচলন। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের কারণে কৃষি পণ্যের ক্ষতি সামাল দিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে শস্য/কৃষি বিমা চালু করা। আবহাওয়ার উপাদানভিত্তিক নতুন মডেলের শস্য বিমা চালু করে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সহিষ্ণুতা বাড়ানো।

২.৩.৫ একই রকম বিমা স্কিম অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন: বাসস্থান, গবাদি-পশু এবং অন্য যে কোনও ধরনের সম্পত্তির বেলায় প্রণয়ন করা। এই স্কিম দুর্যোগ-ঝুঁকিতে থাকা পরিবারগুলোর কল্যাণে সরাসরি ভূমিকা পালন করবে। এ ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের সঙ্গে অংশীদারির মাধ্যমে এক সঙ্গে কাজ করা।

২.৩.৬ আন্তর্জাতিক ও দেশীয় শ্রমবাজার বিবেচনায় রেখে ঝুঁকিতে থাকা খানা/পরিবারগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অকৃষি খাতে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ অংশীদারির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

২.৩.৭ রেমিট্যান্স প্রেরণকে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং বাস্তুচ্যুতিপ্রবণ এলাকাগুলো থেকে পরিবারের এক বা একাধিক সদস্যর জন্য স্বল্পমেয়াদি চুক্তিভিত্তিক আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসনের সুযোগ তৈরি করা। এই উদ্যোগ খানা/পরিবারগুলোকে দুর্যোগ-ঝুঁকি মোকাবিলায় সহায়তা করবে।

২.৩.৮ প্রান্তিক এবং ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর জন্য অস্থায়ী ও চক্রাকার শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়াকে সহজতর করা। ILO, IOM, UNHCR, UNDP, WFP, UNICEF, UNFPA, WHO, UN WOMEN, UNRCO, IFRC এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার অংশীদারিত্বের মাধ্যমে তা সম্পন্ন করা। কলাম্বিয়া ও স্পেনের শ্রম অভিবাসনের জন্য IOM- এর সহায়তায় প্রণীত Temporary Circular Labour Migration (TCLM) দলিল বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মডেল হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে তা প্রয়োগ করে দেখা।

২.৩.৯ দুর্যোগ ও জলবায়ু বিপদাপন্ন এলাকাগুলোয় আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলো যেমন: জেলা কর্মসংস্থান দপ্তর, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এবং এনজিও শাখা কার্যালয় স্থাপন করা।

২.৩.১০ বিপদাপন্ন এলাকাগুলোতে অভিযোজন সহজতর করতে পরিবারের যেসব সদস্য কাজের জন্য প্রবাসে আছে তাদের বিভিন্ন ধরনের আর্থিক পণ্য যেমন: ওয়েজ আর্নার্স বন্ড, ডায়াসপোরা বন্ড ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য অভিবাসীদের তথ্য প্রদান করা এবং সেগুলো ক্রয়ে উৎসাহিত করা। অভিযোজনে সহায়তার পাশাপাশি এটি দেশে অভিবাসীর সঞ্চয় বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে এবং অভিবাসীর বিদেশে গড়া সম্পদকে দেশে স্থানান্তরে উৎসাহ জোগাবে।

২.৩.১১ বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে তৈরি পোশাক কারখানা ও উৎপাদন কারখানাগুলোতে বাস্তুচ্যুতিপ্রবণ এলাকাগুলো থেকে আসা মানুষদের চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করা। বিপদাপন্ন এলাকাগুলোর জনগণের দক্ষতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ চাকরির প্রস্তুতিতে সহায়তা করার জন্য অনলাইন জব পোর্টাল তৈরি করা। এই বিষয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

২.৩.১২ সর্বজনীন স্বীকৃত নির্দেশনা ও সেন্দাই কর্মকাঠামো অনুসরণ করে বাস্তুচ্যুতি ঘটেছে এমন এলাকাগুলোতে বিদ্যমান ভৌত অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্নির্মাণ করা। বন্যা রোধে বিদ্যমান বাঁধগুলো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে তদারকি জোরদার করা। বিশেষ করে মাঝারি থেকে বড় আকারের বন্যা রোধে বাঁধের ফলপ্রসূতা বুঝতে স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল বিভাগ এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো। বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নদীভাঙন রোধে উপযুক্ত স্থানে নতুন বাঁধ নির্মাণ করা, নদী শাসন করা, লবণাক্ততা রোধে স্লুইসগেইট বসানো এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করা। নদী ও খাল পুনঃখনন ও নদী প্রশিক্ষণে প্রচুর অর্থ যেমন প্রয়োজন তেমনি ভৌগোলিক এলাকাগুলোতে সমন্বিত কার্যক্রমও দরকার। শহর ও আধা-শহরে এলাকাগুলোতে ভূমিকম্পের অবকাঠামোগত ও অ-কাঠামোগত ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং পরিকল্পনায় প্রস্তুতিমূলক ও ঝুঁকি হ্রাসকরণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা।

২.৩.১৩ দুর্যোগের সময় বিপজ্জনক স্থান থেকে সরিয়ে আনার জন্য জনসংখ্যার ঘনত্ব বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জেন্ডার সংবেদনশীল সাইক্লোন ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা।

২.৩.১৪ বাঁধ, আশ্রয়কেন্দ্র এবং পোল্ডারগুলোর বহুবিধ ব্যবহার নিশ্চিত করে সেই এলাকায় বাস্তুচ্যুত হতে পারে এমন পরিবার ও সমপ্রদায়সমূহকে এসব স্থাপনার কাছাকাছি থাকার সুযোগ রেখে স্ব-এলাকায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। বাঁধ, পোল্ডার এবং দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর ভেতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা করা। বিপদাপন্ন জনগণের জন্য গুচ্ছগ্রামের আদলে জলবায়ু সহিষ্ণু আবাসন কর্মসূচির উদ্যোগ নেওয়া।

২.৩.১৫ বিদ্যমান অবকাঠামোগুলো উন্নত করা। খরা অভিযোজন বাড়াতে ক্রসড্যাম এবং পানি নিয়ন্ত্রক কাঠামো নির্মাণ করা। বিশেষ করে নদী বা খাল পুনঃখনন করা, গভীর নলকূপ স্থাপন করা। এ ক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের পানিধারণ সক্ষমতা বাড়ানোর উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া।

২.৩.১৬ পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে সঠিক পরিকল্পনা ও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ভৌত অবকাঠামোগত সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করা। ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও খাপ খাওয়ানোর পদ্ধতি বিবেচনায় নিয়ে কৌশল নির্ধারণ করা।

২.৩.১৭ সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে বসতভিটাকে নিরাপদ স্থানে পরিণত করা; বসতভিটার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন: বিদ্যালয়, জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সগুলোর ভিত উঁচু করা। যদি গ্রাম পর্যায়ে কোনও গৃহায়ণ নীতিমালা না থাকে, তবে দুর্যোগ-ঝুঁকি রোধে আপদভিত্তিক গৃহায়ণ নীতিমালা (HHC) প্রণয়ন নিশ্চিত করা এবং তা বাস্তবায়ন করা। দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণ (ভাসমান গৃহ, লবণাক্ততা-সহিষ্ণু গৃহ ইত্যাদি) করা। এ ক্ষেত্রে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর সম্ভাব্য ঋণাত্মক প্রভাবগুলো দূর করতে পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।

২.৩.১৮ সরকারি-বেসরকারি এনজিও'র অংশীদারিত্বে ভূমিহীন বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য দুর্যোগসহিষ্ণু গুচ্ছ আবাসন ব্যবস্থার নকশা প্রণয়ন ও তা নির্মাণ করা। এসব স্থানে তাদের ভূমি ভোগের অধিকার ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি, বীজতলা রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রাখা। এমন জায়গাকে কেন্দ্র করে স্থাপনা নির্মাণ করা যেখানে জীবিকা নির্বাহ, শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য যাতায়াতের সুযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে প্রথমে পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা।

২.৩.১৯ গ্রামীণ এলাকায় জলবায়ুসহিষ্ণু মডেল আবাসন/বাসস্থান এবং বহুতল-পাকা অবকাঠামো নির্মাণে বিভিন্ন অংশীজনদের উদ্বুদ্ধ করা এবং সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা। গ্রামের মানুষের কাছে শহরের সুবিধা পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকারের 'আমার গ্রাম আমার শহর' শীর্ষক নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণের ক্ষেত্রে বাস্তুচ্যুতদের অভিযোজনের বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত করা।

২.৩.২০ অতি জরুরি বা প্রবল জনস্বার্থ এবং দুর্যোগের সময় ছাড়া অন্য সময়ে জনগণকে তাদের গৃহ বা বাসস্থান থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতকরণ নিষিদ্ধ করা।

২.৪ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রগুলো বিভিন্ন শহরে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা (Creation of Employment through Encouraging Decentralization of Urban Growth Centres)

২.৪.১ সম্ভাব্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির এলাকাগুলোর কাছাকাছি শহরে সরকারি ও ব্যক্তি খাতের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

২.৪.২ কর্মসংস্থান ও আয় সৃষ্টি করতে আঞ্চলিক, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে নগর উন্নয়নকেন্দ্র (UGC) প্রতিষ্ঠা করা, বাস্তুচ্যুত মানুষের মধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রামমুখী হওয়ার প্রবণতা হ্রাস করা। শহরতলি এলাকাগুলোয় সেবাপ্রদানকারী ব্যক্তিদের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রেখে সেসব স্থানে স্বল্প ভাড়ার আবাসন ব্যবস্থা,

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করা। নগরকেন্দ্রগুলোর স্থান আঞ্চলিকভাবে নির্ধারণ করা।

২.৪.৩ নগর এলাকাগুলোতে অধিক জনসংখ্যার চাপ পরিহার করতে পরিবহন সেবার গুণগত ও পরিমাণগত মান বৃদ্ধি করা। বাসের বদলে কমিউটার ট্রেন চালুর প্রতি মনোযোগ দেওয়া। দুর্যোগ কবলিত জনগোষ্ঠীর যাতায়াত খরচ কমিয়ে মূল শহরে বসবাস না করে শহরতলিতে থাকতে উৎসাহিত করা এবং বড় শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা হ্রাস করা।

২.৪.৪ কর্মসংস্থানের জন্য যাতে বাস্তুচ্যুতদের নিজ এলাকা ছেড়ে স্থায়ীভাবে শহরে বসবাস করতে না হয় সেজন্য কর্মসংস্থানের বিকেন্দ্রীকরণের পাশাপাশি কমিউটার ট্রেনের ব্যবস্থা করা যাতে করে তারা তাদের আদি আবাস থেকেই কাজে যেতে পারে এবং দিন শেষে নিজ আবাসে ফিরে আসতে পারে।

২.৪.৫ ধীর গতির দুর্যোগে অভিযোজনের জন্য ভুক্তভোগীদের অনেকেই আগে থেকে শহরে চলে যায়। এই শ্রেণির ভুক্তভোগীদের শহরে/শহরতলিতে আবাসনের জন্য প্রকল্প নেয়া। বহুতল বিশিষ্ট দালান নির্মাণ করে নিচের তলাগুলোতে বাজার, ফার্মেসি, ডাক্তারের চেম্বার, চুল কাটার সেলুন, শিশু দিবাযত্নকেন্দ্রসহ সকল সেবার স্থান নির্ধারণ করে শহরের ফুটপাতগুলো মুক্ত রাখা । স্বল্প খরচে দোকানগুলো ভাড়া দিয়ে বাস্তুচ্যুত পরিবারের সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। ওপরের তলাগুলোয় চুক্তির ভিত্তিতে স্বল্প ভাড়ায় বাস্তুচ্যুতদের থাকার ব্যবস্থা করা। এর মালিকানা সরকারের কাছে রাখা এবং নির্মাণ ও পরিচালনা কাজে যথাক্রমে ব্যক্তি খাত এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করা।

২.৫ জলবায়ু দুর্যোগ ঝুঁকি-সহনীয় ভূমি পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন (Climate-disaster Risk Responsive Land Use Plan and Programme)

২.৫.১ জলবায়ু ও দুর্যোগ ঝুঁকি-সহনশীল ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা করা।

২.৫.২ অধিক ঝুঁকিপূর্ণ অনিরাপদ এলাকা চিহ্নিত করে সেই এলাকাগুলোয় মানব বসতি নিষিদ্ধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২.৫.৩ উপকূলীয় ও সমুদ্র বন্দর এলাকাগুলোয় সরকারের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা যেমন: অর্থনৈতিক অঞ্চল ইত্যাদিতে বাস্তুচ্যুত মানুষদের একত্রীকরণ এবং ওই সব এলাকায় স্বল্প ভাড়ায় গৃহায়ণ সুবিধাসহ নাগরিক সুবিধাসমূহ প্রদান সাপেক্ষে উপশহর প্রতিষ্ঠা করা।

২.৫.৪ সামগ্রিক ভূমি নীতিমালা এবং আঞ্চলিক ভূমি বিধিমালা নিশ্চিত করা। পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহারের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসের অভিযোজন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করা। চর ও উপকূলীয় এলাকা এবং বাঁধ এলাকাগুলোয় বনায়ন করার লক্ষ্যে বন কর্মকর্তাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ বরাদ্দ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা। উপকূলীয় এলাকাগুলোয় স্থায়ী সবুজ বেষ্টনী যথাযথভাবে নিশ্চিত করা। প্রান্তিক পরিত্যক্ত জমিতে কোনও প্রকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন না করা।

২.৫.৫ পরিবেশগতভাবে বিপদাপন্ন অঞ্চলগুলো থেকে কাজের খোঁজে আসা বাস্তুচ্যুত মানুষেরা যাতে শহরের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ প্রান্তিক এলাকায় আটকে না পড়ে সেজন্য তাদের আবাসনের স্থান নগর পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা। মৌজা বা

অঞ্চলভিত্তিক খাস জমি শনাক্ত করে এগুলোতে বাস্তুচ্যুতদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভূমি ব্যবহার বিধিমালা তৈরি করা। এই সব খাস জমি জলবায়ুসহিষ্ণু গুচ্ছ আবাসন প্রকল্পের জন্য এবং সম্ভাব্য বাস্তুচ্যুতদের জীবিকার জন্য বরাদ্দ দেওয়া। মালিকানা প্রদান না করেও জলবায়ুসহিষ্ণু আবাসন তৈরি করে স্বল্প ভাড়ায় অভিবাসীদের থাকার সুযোগ তৈরি করা।

২.৫.৬ যৌথ ব্যবস্থাপনায় টেকসই ব্যবহার ও চর্চা অনুসরণ করে উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহারের জন্য একটি 'কমন রিসোর্স পুল' বা 'যৌথ সম্পদ ভান্ডার' সৃষ্টি করার আইনি কাঠামো তৈরি করা। এতে ভূমি ও জলাশয় অন্তর্ভুক্ত করা। দরিদ্র, প্রান্তিক এবং দুর্যোগ ও জলবায়ুজনিত কারণে বাস্তুচ্যুত মানুষের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করা। উচ্চশ্রেণির দ্বারা এসব সম্পদ দখলের সুযোগ বন্ধ করা।

৩. বাস্তুচ্যুতিকালীন সুরক্ষা (Protection During Displacement)

উদ্দেশ্য: বাস্তুচ্যুতি ঘটার সময়ে দুর্যোগকবলিতদের জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশক বিষয়সমূহ তথা মানবিক সহায়তাসহ মৌলিক অধিকারভিত্তিক সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা।

কৌশলগত সাড়াদান: বাস্তুচ্যুতি ঘটার সময় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া এবং জরুরি মানবিক সহায়তা প্রদান করার সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর সুরক্ষা নিশ্চিত করা। সাধারণভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগজনিত কারণে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনায় জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ বিষয়ক জরুরি নির্দেশিকা এবং আর্দশমান অনুযায়ী প্রাণিসম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

প্রধান নীতিক্ষেত্রসমূহ: দুর্যোগকালীন মানবিক সহায়তা।

প্রধান কার্যক্রম (সাড়াদানের ব্যবস্থাপনা: জরুরি সাড়াদান)

৩.১. মানবিক ও দুর্যোগ ত্রাণ কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণ: বাস্তুচ্যুতির জরুরি ধাপে, দুর্যোগের প্রকারভেদে বাস্তুচ্যুতিকালীন মানবিক সুরক্ষা ও সহায়তা প্রদানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুলোকে সঙ্গে নিয়ে যে কাজগুলো করবে:

৩.১.১ বাস্তুচ্যুত মানুষের চাহিদা নিরূপণ করে Sphere Standards অনুসারে যথাযথ সাড়াদান কার্যক্রম পরিচালনা করা। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক জীবন রক্ষাকারী চারটি মানবিক সহায়তা হলো: পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করা; খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি; আশ্রয় ও পুনর্বাসন; এবং স্বাস্থ্য কার্যক্রম। ১৯৯৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সুরক্ষা নীতিমালা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ব্যক্তি সুরক্ষায় IASC- এর কার্যবিধি নির্দেশিকা, দ্য মেন্ড (The MEND) নির্দেশনাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অধিকারভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানদন্ড গুলোর আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে কার্যকর করা।

৩.১.২ স্থানান্তরিত হওয়ার সময় নিরাপত্তা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখা এবং পরিবারের কোনও সদস্য যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায় তা নিশ্চিত করা। শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা।

৩.১.৩ বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে নিকটবর্তী কোনও আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যেতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। প্রয়োজনে তাদের আশ্রয়স্থলে পরিবহন সুবিধা প্রদান করা। আশ্রয়কেন্দ্রে নারী,গর্ভবতী মা, শিশু, কিশোরী, সিনিয়র সিটিজেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত স্থান নির্ধারণ করা।

৩.১.৪ জাতীয় বাস্তুচ্যুতি ট্র্যাকিং ব্যবস্থা চালু করে বাস্তুচ্যুত পরিবার ও ব্যক্তিদের বাস্তুচ্যুতি ঘটার সময় নিবন্ধন করা। এই নিবন্ধন ব্যবস্থা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনায় ও হারিয়ে যাওয়া পরিবারের কোনও সদস্যকে খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা।

৩.১.৫ জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ত্রাণ সামগ্রী মজুতের জন্য সকল জেলা ও উপজেলায় ত্রাণ গুদাম নির্মাণ করা। জরুরি ভিত্তিতে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য জলপথ ও আকাশপথে বিকল্প যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা।

৩.১.৬ পর্যাপ্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ খাবার পানি ও পানি বিশুদ্ধকরণ সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা। জরুরি প্রয়োজনে নারীদের জন্য আলাদাসহ ভ্রাম্যমাণ টয়লেট স্থাপন করা। জরুরি স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে মেডিকেল টিম প্রস্তুত রাখা এবং দ্রুত প্রেরণ করা।

৩.১.৭ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত জরুরি দলিলাদি যেমন: জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্মনিবন্ধন, পাসপোর্ট, এবং নিকাহনামা হারিয়ে গেলে তা পুনঃপ্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা। দুর্যোগের ফলে হারিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়া এ সকল দলিলের কারণে বাস্তুচ্যুত মানুষ যেন তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করা।

৩.১.৮ সুরক্ষা-ঝুঁকির মুখোমুখি নারী, গর্ভবতী মা, অনাথ শিশু, কিশোর-কিশোরী বয়োবৃদ্ধ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তাদের বিভিন্ন ধরনের চাহিদা নিরূপণে পদক্ষেপ নেওয়া।

৩.১.৯ বাস্তুচ্যুত মানুষ ও মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। মানবিক সহায়তা যেন কোনও প্রকার বাধা ছাড়াই সংশ্লিষ্ট স্থানে পৌঁছাতে পারে তার জন্য ত্রাণ সামগ্রী ও মানবিক সহায়তা প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গের চলাচলের অনুমতি প্রদান ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক ও জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে কাজ করা।

৩.১.১০ আর্থিক খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে বিপদাপন্ন পরিবার ও দুর্যোগের সময় পরিবারগুলোর রেমিট্যান্স প্রাপ্তিতে যেন অসুবিধা না হয় তা নিশ্চিত করা। যদি লেনদেনের সময় প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাগজপত্র দুর্যোগের কারণে হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে রেমিট্যান্স গ্রহণে সেসব কাগজপত্রের শর্ত শিথিল করা।

৩.১.১১ দুর্যোগের পর পুনরুদ্ধার ও পুনঃনির্মাণ কার্যক্রম বিশেষ করে আবাসন খাতকে বিবেচনায় রেখে একটি সামগ্রিক নীতিমালা তৈরি করা।

৩.১.১২ বিভিন্ন প্রশাসনিক পর্যায়ে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলির বিভিন্ন ধারায় যে দায়িত্বসমূহ দেওয়া আছে, সেগুলো সম্পর্কে তাদের স্পষ্টভাবে নিয়মিত অবহিত করা। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি মোতাবেক ওয়ার্ড পর্যায়ে পর্যন্ত গঠিত কমিটিসমূহকে সক্রিয় রাখা।

৩.২ দুর্যোগের সময় বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের মৌলিক মানবাধিকার সুরক্ষা (Protecting fundamental rights of DCIIDPs during Displacement)

উদ্দেশ্য: বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সাংবিধানিক অধিকার সংরক্ষণ করা।

প্রধান কার্যক্রম:

৩.২.১ বাস্তুচ্যুত মানুষের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা। প্রশাসনের সকল স্তরে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু রাখা। প্রয়োজনে ২৪ ঘণ্টা হটলাইন নম্বর ও বিশেষ পুলিশি টহলের ব্যবস্থা রাখা ।

৩.২.২ কোনও ব্যক্তিকে জোরপূর্বক বেআইনিভাবে অপসারণ না করা। নির্দিষ্ট কোনও স্থানে ফিরে যেতে বা থাকতে বাধ্য না করা।

৩.২.৩ দুর্যোগের প্রকারভেদ অনুসারে বাস্তুচ্যুত মানুষদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে আবাসন ও আশ্রয় কেন্দ্র নিশ্চিত করা। বাস্তুচ্যুতদের স্থায়ী ও নিরাপদ পুনর্বাসন নিশ্চিত না করা পর্যন্ত তাদের জন্য অস্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা রাখা।

৩.২.৪ ভূমি ব্যবহার নীতিমালা ২০০১ অনুযায়ী ভূমি মন্ত্রণালয়ের পরামর্শে খাস জমি শনাক্ত করে গৃহহীন বাস্তুচ্যুত মানুষদের সে সব জায়গায় আইনি সুরক্ষার মাধ্যমে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং একটি সাধারণ বা এজমালি সম্পদ ভান্ডার (Common Resourse Pool) তৈরি করা যেখানে বাস্তুচ্যুত মানুষজনের প্রবেশাধিকার থাকবে। গৃহহীন বাস্তুচ্যুত মানুষদের জন্য প্রয়োজনে মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থার সহায়তায় জরুরি ও অন্তর্বর্তীকালীন আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করা। সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

৩.২.৫ বাস্তুচ্যুত মানুষদের খাদ্য, পানি, বস্ত্র, স্যানিটেশন, চিকিৎসাপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা। এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, শিশু, অনাথ শিশু, বয়স্ক, মহিলা, গর্ববতী মা, কিশোরী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন গোষ্ঠীকে প্রাধান্য দেওয়া।

৩.২.৬ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের বিশেষ করে শিশু ও যুবকদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২-এর ২৬ ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনে ভবন অধিগ্রহণ করে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা। কোনও বাস্তুচ্যুত শিশু বা কিশোর-কিশোরী শিক্ষার্থীকে পূর্বের বিদ্যালয়ের নথিপত্র প্রদর্শন করতে না পারার অজুহাতে শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত না করা।

৩.২.৭ বিদ্যালয়গুলোতে শারীরিকভাবে অক্ষম বাস্তুচ্যুত শিশুদের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা। নগরকেন্দ্রগুলোতে স্থানীয় শিশুদের সঙ্গে শিক্ষার মূলধারায় বাস্তুচ্যুত শিশুদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। বাস্তুচ্যুত শিশুদের পিতামাতাদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা, যাতে তারা শিশুদের বিদ্যালয় কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে এবং বাল্যবিবাহের মতো ক্ষতিকর প্রথাগত চর্চাগুলো পরিহার করে।

৩.২.৮ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রমের বন্দোবস্ত করে দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোর মানুষের দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে জীবিকা নির্বাহের অধিকার নিশ্চিত করা।

৩.২.৯ প্রবাসী ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক্রমে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্বল্প মেয়াদি আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসনের এবং দেশের অভ্যন্তরে চাকরির সুযোগ তৈরি করা। বাস্তুচ্যুত মানুষদের জন্য একটি জব পোর্টাল তৈরী করা।

৩.২.১০ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও জীবিকা উন্নয়ন কর্মসূচিগুলো চালু করার আগে, যারা এ সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে সে সব পেশায় তাদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বাজার বিশ্লেষণ করা।

৩.২.১১ বড় কারখানাগুলোকে বাস্তুচ্যুত মানুষদের নিয়োগ দিতে উদ্বুদ্ধ করা। বেসরকারি খাতকে তাদের করপোরেট সামাজিক দায়িত্ব কার্যক্রমের অধীনে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের নিয়োগ দিতে উৎসাহিত করা। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিশেষ সুপারিশের ব্যবস্থা চালু করা।

৩.২.১২ ব্যক্তির ইচ্ছা ও আগ্রহ ব্যতিরেকে তার সম্পত্তি ব্যবহারের জন্য কোনও প্রকার চাপ প্রয়োগ না করা।

৩.২.১৩ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জমি ক্রয়ের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ অথবা ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৩.২.১৪ বাস্তুচ্যুত সকল ব্যক্তির সমন্বিত ও লিঙ্গ সংবেদনশীল স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করা। বিশেষ করে দরিদ্র শ্রেণির ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা। প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ ক্লিনিক সেবা চালু করা।

৩.২.১৫ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বাস্তুচ্যুত মানুষদের জন্য প্রয়োজনে সামাজিক ভাতা কার্যক্রম চালু করা।

৩.২.১৬ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের ভোটে অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করা। সকল বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি ও প্রান্তিক সামাজিক গ্রুপগুলোর জন্য প্রত্যাবর্তন, সমন্বিতকরণ এবং পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা।

৪ স্থায়ী সমাধানসমূহ (Durable Solutions)

উদ্দেশ্য: বাস্তুচ্যুত মানুষের সাংবিধানিক অধিকার সমূহের আলোকে এই পর্যায়ে রাষ্ট্র কর্তৃক বাস্তুচ্যুতদের সম্মানজনকভাবে স্থায়ী সমাধানে পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা এবং ইন্টার-এজেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটির (IASC)'র স্থায়ী সমাধানের কাঠামো অনুযায়ী এমন পরিস্থিতির টেকসই সমাধান করা যাতে দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট কোনও সমস্যা মোকাবিলায় বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের আর বাইরের কোনও সহযোগিতার প্রয়োজন না হয়। যেমন:

কৌশলগত সাড়াদান (Strategic response): বাস্তুচ্যুতির সংকট দীর্ঘায়িত হতে না দিয়ে তার স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করার জন্য তিন ধরনের পদক্ষেপ নেয়া। এগুলো হলো:

অ) দুর্যোগ শেষ হয়ে গেলে নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তন;

আ) নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তন সম্ভব না হলে বাস্তুচ্যুত হয়ে যে এলাকায় বসবাস করেছে সেখানেই একীভূত হওয়ার সুযোগ তৈরি করা;

ই) যেসব ক্ষেত্রে এই দুটো সমাধানের কোনোটাই সম্ভব নয় সেসব ক্ষেত্রে অন্যত্র স্থানান্তর ও পরিকল্পিত পুনর্বাসন। দুর্যোগের পরে স্ব-স্থানে প্রত্যাবর্তনই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সমাধান।

যদি স্ব-স্থানে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব বা কাঙ্খিত না হয় সে ক্ষেত্রে অন্য দুই বিকল্প বিবেচনায় রাখা যেতে পারে।

কৌশলপত্রে বিবেচ্য মূলনীতি সমূহ: পুনর্বাসন; নগর উন্নয়ন (জাতীয় নগর উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৯ খসড়া); পল্লি উন্নয়ন (জাতীয় পল্লি উন্নয়ন নীতিমালা, ২০০১); ভূমি নীতিমালা (জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা, ২০০১); গৃহায়ণ নীতিমালা (জাতীয় গৃহায়ণ নীতিমালা, ২০১৬)

প্রধান কার্যক্রম (স্থায়ী সমাধান)

বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বাছাই করবে স্থায়ী তিনটি সমাধানের মাঝে কোনটি তার জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী, নিজ বসতভিটায় ফেরা, স্থানীয় পর্যায়ে একীভূতকরণ অথবা নিরাপদ ও পরিকল্পিত পুনর্বাসন। যে কারণে বাস্তুচ্যুত হয়েছে, সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে তাঁকে স্ব-এলাকাটি বাস উপযোগী কিনা এবং সেখানে ফিরে যাবেন কিনা সে বিষয়ে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দেওয়া। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ এবং পরামর্শ দানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এই প্রক্রিয়াটিকে প্রতিনিধিত্বশীল ও অংশগ্রহণমূলক করা।

ইন্টার-এজেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটির (IASC) কাঠামো টেকসই সমাধানের মোট ৮টি উপাদান শনাক্ত করেছে। সেগুলো হলো:

অ) সুরক্ষা ও নিরাপত্তা;

আ) জীবনযাত্রার নির্দিষ্ট মান;

ই) জীবিকার সুযোগ;

ঈ) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তি পুনরুদ্ধার;

উ) প্রয়োজনীয় নথিপত্র পুনঃপ্রাপ্তির সুযোগ;

ঊ) পরিবারের সদস্যদের পুনরেকত্রিত হওয়ার সুযোগ;

ঋ) সরকারি সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণের সুযোগ;

এ) কার্যকর প্রতিকার ও ন্যায় বিচার পাওয়ার সুযোগ।

তবে যে কোনও বাস্তুচ্যুতির ক্ষেত্রেই সকল ৮টি উপাদানই যে প্রয়োগযোগ্য হবে, তা নয়।

৪.১ **প্রত্যাবর্তন:** প্রত্যাবর্তন যাতে টেকসই হয় তা নিম্নোক্ত কার্যক্রমগুলোর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করতে পারে:

৪.১.১ স্ব-এলাকায় প্রত্যাবর্তন স্থায়ী সমাধান কিনা তা বুঝতে হলে প্রয়োজন সেই এলাকার সুরক্ষা ও নিরাপত্তার অবস্থা যাচাই করা।

৪.১.২ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের তাদের পূর্বের এলাকার বিদ্যমান অবস্থা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক ও সঠিক তথ্য প্রদান করা যাতে তারা স্বেচ্ছা প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেবার আগে নিজেরাই অবস্থা যাচাই করতে পারে। এ ক্ষেত্রে স্ব-এলাকায় দেখে আসার সুযোগ তৈরি করা।

৪.১.৩ প্রতিবেশব্যবস্থা এবং প্রতিবেশব্যবস্থার সুবিধা সুরক্ষার উপায় নিশ্চিত করা। স্ব-এলাকায় ফিরে যাওয়া ব্যক্তির বাড়ি, ভূমি এবং সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা এবং প্রয়োজনে এইচএলপি (HLP) বিকল্পের সুযোগসহ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।

৪.১.৪ স্ব-এলাকায় ফিরে যাওয়া ব্যক্তির পর্যাপ্ত জীবন মান এবং মৌলিক সেবা নিশ্চিত করতে এলাকাগুলোয় বসত বাড়ি, খাবার পানি এবং মৌলিক সেবা সম্পর্কিত অবকাঠামো পুনঃনির্মাণে সহায়তা করা।

৪.১.৫ সরকারি, ব্যক্তি খাত, এনজিও এবং আইএনজিও প্রতিষ্ঠান সমূহের অংশীদারির মাধ্যমে ফিরে যাওয়া বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য স্বল্প মূল্যে দুর্যোগ ও জলবায়ু সহিষ্ণু বসত বাড়ি সরবরাহের ব্যবস্থা করা। দুর্যোগের ধরন অনুযায়ী স্বল্প মূল্যের বাড়ির নকশা করা। জাতীয় ভূমি নীতিমালার ধারা অনুযায়ী ভূমিহীন মানুষদের জন্য জমি পেতে সহায়তা করা। বরাদ্দকৃত জমিগুলোতে বিশুদ্ধ খাবার পানি ও অবকাঠামোগত সুদৃঢ় অবস্থান, মূল কর্মক্ষেত্রের নিকটতম, সেবাদান প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সুদৃঢ় অবস্থান নিশ্চিত করে ভূমি প্রদান প্রকল্প গ্রহণ করা। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ব্যবহার করা (সুপেয় পানি, এলিভেটেড টিউবওয়েল এবং ল্যাট্রিন, বন্য ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু শস্য উৎপাদন, ভাসমান কৃষি, ভাসমান খাঁচায় মাছ চাষ ইত্যাদি)

৪.১.৬ ঋণ সুবিধা সরবরাহ করা যাতে গৃহ নির্মাণ, খামার এবং দোকানপাট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে পুনর্বাসন এলাকা বাসযোগ্য করা যায়। এই কার্যক্রমে বিপদাপন্ন বিভিন্ন মানুষজনকে যেমন: নারী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, জীবিকা নির্বাহের সুযোগ পায় না এমন অতি দরিদ্র, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বাইরের এ ধরনের মানুষজনকে বিবেচনায় আনা।

৪.১.৭ প্রত্যাবর্তিত এলাকাগুলোতে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা অথবা বিকল্প জীবিকা নির্বাহের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪.১.৮ নারী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, অতি দরিদ্র মানুষদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। আয় সৃষ্টির উৎসসমূহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাস্তুচ্যুত পরিবারের সদস্যের জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসনের সুযোগ সৃষ্টি করা। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সহযোগিতায় বাস্তুচ্যুত পরিবারের সদস্যদের কাজের জন্য মধ্যপ্রাচ্য বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশে যাওয়ার খরচ বহনের নিমিত্ত ঋণ সহায়তার সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪.২ **স্থানীয়ভাবে একীভূতকরণ (Local Integration):** পরিবেশের অবনতির কারণে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে যখন দুর্গত এলাকাতে বসবাস করা আর সম্ভব হবে না, অথবা নদীভাঙন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও জমিতে লবণাক্ততা প্রবেশ ইত্যাদি পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি তার নিজ এলাকায় আর প্রত্যাবর্তন করতে পারছে না। এ ধরনের পরিস্থিতিতে স্থায়ীভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি যে এলাকায় প্রাথমিকভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল সেখানেই তাদের বসত, জীবন ও জীবিকা গড়ে তোলা। এ ধরনের সমাধানকেই বলা হয় অভিবাসনের স্থানে একীভূতকরণ। স্থানীয়ভাবে একীভূতকরণে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গুরুত্বপূর্ণ:

৪.২.১ খসড়া জাতীয় নগর সেক্টর নীতিমালা ২০১৪-এ বিভিন্ন ধারায় যে সুযোগগুলো বর্ণিত আছে, অনানুষ্ঠানিক বসতিগুলোতে বসবাসরত বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিরা যাতে সেগুলো ভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করা। শহরের যেসব স্থানে বস্তি রয়েছে, সেগুলোর মান উন্নয়ন এবং শহরে দরিদ্র ভাড়াটিয়াদের অধিকারের সুরক্ষা প্রদান করা।

৪.২.২ উচ্ছেদের ক্ষেত্রে বস্তিবাসী এবং ভাসমান লোকদের জন্য উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রাখা। জমির মালিকানা হস্তান্তর না করে, বেসরকারি খাত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীদারিতে স্বল্প ভাড়ায় গৃহায়ণ প্রকল্প পরিচালনা করা। ভাড়াটিয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে Usufruct প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখা।

৪.২.৩ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জন্য ভূমি ইজারা, ভাড়া ও বিক্রি করার ক্ষেত্রে গোষ্ঠীভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করা। আয় সৃষ্টির জন্য যৌথ খামার উৎসাহিত করা। এসব বিষয়ে ঋণ প্রদান করা।

৪.২.৪ জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন স্থানীয় প্রকল্প গ্রহণ এবং সেবার মান বাড়িয়ে অভিবাসন এলাকায় একীভূতকরণ সহজ করা। স্থানীয় শ্রম বাজারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা। বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের স্বল্পমেয়াদি আন্তর্জাতিক বাজারে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া।

৪.২.৫ স্থানীয় একীভূতকরণ কার্যক্রমে ওই এলাকার আগে থেকে বসবাসরত স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অংশীদার করে নেওয়া। স্থানীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে, যেসব সুযোগ বাস্তুচ্যুতদের জন্য তৈরি হবে, সেগুলোতে ওই এলাকার দরিদ্র লোকদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪.২.৬ বাস্তুচ্যুত মানুষ ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেকোনও বিবাদ স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে মিটমাট করার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৪.২.৭ বাস্তুচ্যুতরা যাতে তাদের অভিবাসনের স্থানে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে তার সুযোগ তৈরি করা।

৪.২.৮ যে কোনও দলিল ও কাগজপত্র হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হলে তা পুনরায় পাওয়ার এবং এর মাধ্যমে বৈষম্যহীনভাবে সেবা পাওয়ায় বাস্তুচ্যুতদের সুযোগ নিশ্চিত করা।

৪.২.৯ দুর্যোগের কারণে পরিবারের কোনও সদস্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে তাদের পুনর্মিলনের/পুনরেকত্রীকরণ ব্যবস্থা করা এবং নির্ভরশীল সদস্য যেমন: শিশু, শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদের মূল পরিবারের সঙ্গে থাকার সুযোগ নিশ্চিত করা।

৪.২.১০ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধনের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া। বিশেষ করে ভোটার আইডি কার্ড বরাদ্দ করা। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির নির্বাচন করা ও ভোটাধিকার প্রয়োগ করার অধিকার নিশ্চিত করা।

৪.৩ **পরিকল্পিত পুনর্বাসন:** স্ব-এলাকায় প্রত্যাবর্তন বা স্থানীয়ভাবে একীভূতকরণ সম্ভব না হলে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের নিরাপদ কোনও জায়গায় পরিকল্পিতভাবে পুনর্বাসন করা। পরিকল্পিত পুনর্বাসন শুধু তাদের জন্য যারা তাদের এলাকায়

আর প্রত্যাবর্তন করতে পারছে না; এমনকি অন্য কোনও স্থানে আপন উদ্যোগে বসতি স্থাপন অথবা আয়ের সংস্থান করতে পারছে না এমন ব্যক্তিদের জন্য। পরিকল্পিত পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজন যথাযথ অর্থ, ভূমি, আবাসন, জীবিকা এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম।

৪.৩.১ পুনর্বাসন কার্যক্রমে দুর্যোগ কবলিত বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা। এমন অংশগ্রহণ অবশ্যই হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক। আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর কোনও অংশই ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, জন্মস্থান ও অক্ষমতার কারণে বৈষম্যর শিকার হবে না।

৪.৩.২ পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তুচ্যুতদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংরক্ষণের চেষ্টা করা, সামাজিক নেটওয়ার্কগুলো পুনরায় গড়ে তুলতে সহায়তা করা এবং সর্বোপরি পুনর্বাসন-এলাকায় জীবিকা নির্বাহের কার্যকর সুযোগ তৈরি করা। এ সকল পরিকল্পনাকে অংশগ্রহণমূলক করা, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি উন্নীতকরণ, হারানো সম্পদ এবং ভূমির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান, পুনর্বাসিত জনগোষ্ঠীর বসতি ও জমি রক্ষণাবেক্ষণ, ভাড়াটিয়ার অধিকার ইত্যাদি নিশ্চিত করা। পরিবেশগতভাবে টেকসই এলাকাতেই পুনর্বাসন কাজ পরিচালনা করা।

৪.৩.৩ ভূমি মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের পরামর্শে ভবিষ্যৎ পুনর্বাসনের জন্য উপযুক্ত জমি/ভূমি শনাক্ত করা। দুর্যোগ প্রবণ এলাকা থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরকারি খাস জমি চিহ্নিত করে সংরক্ষণ করা এবং এ সকল ভূমি অন্যান্য ব্যক্তিদের বরাদ্দ নিরুৎসাহিত করা।

৪.৩.৪ সরকারি ভূমি হোল্ডিংগুলো যাচাইয়ের মাধ্যমে তাদের মধ্য থেকে দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনের জন্য জমি নির্ধারণ করে সেই জমি বাজার থেকে Land set-aside programmes- এর মাধ্যমে আলাদা করে সরিয়ে রাখা। সিঙ্গাপুর বা মালদ্বীপকে অনুসরণ করে Land Reclamation পদ্ধতিতে নতুন জমি তৈরি করে অথবা সমুদ্রের জেগে ওঠা চরে ভূমি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এমন অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা। চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট (CDSP) এর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বাস্তুচ্যুতদের আবাস এবং কর্ম নিশ্চিত করা সাপেক্ষে চর এলাকায় পরিকল্পিত পুনর্বাসন করা।

৪.৩.৫ সকল প্রকার খাস জমির নথি সংরক্ষণের জন্য খাস ভূমি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা। এই নথিভূক্তকরণের সময় ভূমির ধরন, অবস্থান, বণ্টন মর্যাদা, বিবাদ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা ইত্যাদি তথ্য নথিতে রাখা। খাস জমিগুলোকে পুনর্বাসনের জন্য স্থিতিশীল উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৪.৩.৬ Community Land Trust সৃষ্টি ও ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা। ট্রাস্টের ভূমির ওপর যৌথ নিয়ন্ত্রণ সব সময়ের জন্য নিশ্চিত করা। অতীতের বাস্তুচ্যুত জনগণের ব্যবহার করা ভূমি, তাদের প্রয়োজন শেষে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়ে গেলে পরবর্তীতে নতুনভাবে বাস্তুচ্যুত হওয়া জনগণের জন্য সেটি ব্যবহারের ব্যবস্থা।

৪.৩.৭ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যেসব পরিবার নদীভাঙনের কারণে ভূমিহীন, আশ্রয়হীন অথবা বাস্তুচ্যুত হয়েছে, সেসব পরিবারকে স্বল্প মেয়াদে সরকারি আশ্রয়ণ/আদর্শ গ্রাম প্রকল্পে জাতীয় পল্লি উন্নয়ন নীতিমালা ২০০১ অনুযায়ী পুনর্বাসন করা। পুনর্বাসন সাইটগুলোতে সরকারি-বেসরকারি-এনজিওর অংশীদারিতে স্বল্প মূল্যে বাস্তবসম্মত ও টেকসইভাবে সামাজিক আবাসন স্কিমের ব্যবস্থা করা।

৪.৩.৮ পুনর্বাসন সাইটগুলোতে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ রাখা। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে নারী, শারীরিকভাবে অক্ষম, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং হতদরিদ্র মানুষদের শ্রম বাজারে প্রবেশাধিকারের বিশেষ ব্যবস্থা করা। জীবিকার বৈচিত্র্য নিশ্চিত করতে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অভিবাসনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪.৩.৯ পুনর্বাসন সাইটগুলোর উন্নয়নে ব্যক্তি খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। বাস্তুচ্যুত হয়েছে এমন ব্যক্তিদের নিয়োগে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে ব্যক্তি খাতকে উদ্বুদ্ধ করা।

৪.৩.১০ শহরতলিতে আবাসন সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ কমিউনিটি গড়ে তোলার বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া। এ ব্যবস্থায় বহুতল বিশিষ্ট দালান নির্মাণ করে নিচের তালাগুলোতে বাজার, ফার্মেসি, ডাক্তারের চেম্বার, চুল কাটার সেলুন, শিশু দিবাযত্নকেন্দ্রসহ সকল সেবার স্থান নির্ধারণ করা। যাতে করে শহরের ফুটপাতগুলো মুক্ত রাখা যায়। স্বল্প টাকায় এসব দোকানগুলো ভাড়া দিয়ে বাস্তুচ্যুত পরিবারের সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। ওপরের তালাগুলো স্বল্প ভাড়ায় চুক্তির ভিত্তিতে বাস্তুচ্যুতদের থাকার ব্যবস্থা করা। এর মালিকানা সরকারের কাছে রাখা এবং নির্মাণ ও পরিচালনা কাজে যথাক্রমে ব্যক্তি খাত এবং এনজিও সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করা।

৪.৩.১১ পুনর্বাসন কার্যক্রমগুলো যেন আন্তর্জাতিক মানদন্ডের হয় সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকা। জোরপূর্বক স্থানান্তর পরিহার করে স্থানচ্যুতদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বিকল্প আবাসন ও ভূমি নিশ্চিত করা। স্থানান্তর/পুনর্বাসন সঠিক ব্যবস্থাপনার অধীনে করে, আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জন্য এটিকে একটি টেকসই অভিযোজন কৌশলে পরিণত করা।

৪.৩.১২ পুনর্বাসন স্থান নির্বাচন করার আগে ঝুঁকি নিরূপণ করা যাতে করে সকল পরিকল্পনা এবং পরামর্শ ঝুঁকি নিরূপণের বিষয় বিবেচনায় রেখে পরিচালিত হয়।

৫ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও অর্থায়ন (Institutional Arrangements and Funding)

বর্তমানে সরকারের সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় পর্যায়ে দক্ষতার সঙ্গে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এই কৌশলপত্রটি বাস্তবায়ন করতে সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সকল পর্যায়ে সৃষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা:

৫.১ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটির নিয়মিত বৈঠকে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা।

৫.২ একটি যৌথ অংশীদারি প্ল্যাটফরম তৈরি করা যেখানে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, গবেষক, স্বেচ্ছাসেবী, কারিগরি এবং নীতি নির্ধারকেরা যৌথভাবে কৌশলপত্রটি বাস্তবায়ন করতে পারে।

৫.৩ বাস্তুচ্যুতির বিষয়ক একটি জাতীয় টাস্ক ফোর্স প্রতিষ্ঠা করা। দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি বিষয়ে এটি হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সর্বোচ্চ সংস্থা। টাস্ক ফোর্সের দায়িত্ব হবে এই কৌশল বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা, মন্ত্রণালয় এবং সরকারি অধিদপ্তরেগুলোর সঙ্গে কৌশল বাস্তবায়নের জন্য যোগাযোগ রাখা। মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোর জন্য বিভিন্ন পরামর্শ/সুপারিশ প্রণয়ন করা। এই ব্যবস্থাটিকে অংশগ্রহণমূলক করার জন্য তৃণমূল পর্যায়কে সম্পৃক্ত করা।

৫.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে একটি কারিগরি পরামর্শক কমিটি (Technical Advisory Committee) প্রতিষ্ঠা করা।

৫.৫ আন্তঃমন্ত্রণালয় এবং আন্তঃসংস্থার সমন্বয়ে 'জাতীয় বাস্তুচ্যুতি টাস্ক ফোর্স' গঠন করা। এখানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যেমন: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন সরকারি, এনজিও ও আইএনজিও'র প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সকল মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব টাস্ক ফোর্সের সভাপতি এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ এর সদস্য হিসেবে থাকবেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এই টাস্ক ফোর্সের সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৫.৬ জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি ও উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটিসহ স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোর কার্যক্রমে বাস্তুচ্যুতিকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। কমিটিদ্বয়কে তাদের এলাকাগুলোয় ঘটে যাওয়া বাস্তুচ্যুতি বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান ও পরিসংখ্যান নথিভুক্ত করা এবং পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া।

৫.৭ স্থানীয়/উপজেলা/জেলা সমন্বয় কমিটিতে নিয়মিত বাস্তুচ্যুতি এজেন্ডা অন্তর্ভুক্ত করে স্থানীয় পর্যায়ে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

৫.৮ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের বাস্তুচ্যুতি বিষয়ক কর্মসূচিগুলোর মধ্যে সমন্বয় করা।

৫.৯ বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারি খাস জমি সংরক্ষণ করে রাখতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করা।

৫.১০ কৌশলপত্রটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় বাজেট থেকে অর্থায়ন করে একটি বাস্তুচ্যুতি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা। এ ছাড়া বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড থেকে অর্থ সংগ্রহ করা। প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্ট ফান্ড ব্যবস্থাপনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এই তহবিল গঠন ও ব্যবস্থাপনা করা।

৫.১১ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা থেকে যেমন: ক্ষয়ক্ষতি তহবিল, অভিযোজন তহবিল, সবুজ জলবায়ু তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহ করা। এ জন্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে নিয়ে একটি তহবিল সংগ্রহ ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা। স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের অধীনে আলাদা বাজেট বরাদ্দ করা।

৫.১২ কৌশলপত্র বাস্তবায়নে অর্থায়নের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি-২০১৯ অনুযায়ী বাংলাদেশে কর্মরত বিভিন্ন বহুপাক্ষিক এবং দ্বিপাক্ষিক দাতা সংস্থাকে সম্পৃক্ত করে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করা। এ ছাড়া UNDRR, PDDসহ সকল প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা কামনা করা।

৬ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (Monitoring and Evaluation)

৬.১ কৌশলপত্রটির বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে একটি মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ থাকবে। উক্ত অনু বিভাগের তত্ত্বাবধানে একটি পরিবীক্ষণ (Oversight) কমিটি প্রতিষ্ঠা করা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন অংশীদারদের এই পর্যবেক্ষণে আমন্ত্রণ জানানো।

৬.২ কৌশলপত্র বাস্তবায়নের জন্য একটি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য (SDG) এর আলোকে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা যার ভিত্তিতে ২০২১ এ মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৪১ এ উন্নত দেশ, ২০৭১ এ সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখর এবং ২১০০ সালে নিরাপদ ব-দ্বীপ এ বাংলাদেশ উন্নীত হবে।

৬.৩ সিভিল সোসাইটি, আইএনজিও, এনজিও ও মিডিয়া প্রতিনিধিদের পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা। এই অর্ন্তভুক্তিগুলো এই প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করবে।

৬.৪ একটি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স প্রতিষ্ঠা করা। এই ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে বিভিন্ন মানদন্ড ও সূচক ব্যবহার করে বাস্তবায়ন পরিমাপ করা।

৬.৫ সাফল্য অর্জন, কৌশল বাস্তবায়নে বাধা ও শিক্ষণীয় বিষয়াবলি এবং সুপারিশসমূহ উল্লেখ করে একটি বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করা।

———————o———————